

লোকসাহিত্যে প্রাচীন গীতিকথা

মণিকা রায় কুন্ডু

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/19_Manika-Roy-Kundu.pdf

সারসংক্ষেপ: খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পূর্ব মৈমনসিংহ গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনে ছিল। পরে এই প্রদেশ গুপ্ত শাসন হতে স্বতন্ত্র হয়ে প্রাগজ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হয়েছিল। কামরূপের শাসনে এই দেশ একসময় হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। চীনা পর্যটক এই সকল দেশের লোকের চরিত্র ও শিক্ষা দীক্ষার প্রশংসা করে গিয়েছেন। প্রাগজ্যোতিষপুরের অবনতির পরে পূর্ব মৈমনসিংহ কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। রাজবংশীয়, কোচ এবং হাজাং প্রভৃতি শ্রেণির লোকেরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করতেন। প্রাগজ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং মুসলমান বিজয় এতদুভয়ের অন্তর্গত দুই-তিন শতাব্দীকাল অপর এক রাষ্ট্রীয় মহাশক্তি এই পূর্ব মৈমনসিংহ দেশটিকে গ্রাস করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেন বংশীয় রাজাগণ পশ্চিম মৈমনসিংহ অধিকার করলে ও বহু বিল সমন্বিত, নদীমাতৃক, বর্ষায় দুর্গম ও অরণ্যবহুল পূর্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারেন নি। পূর্ববঙ্গ গীতিকার গ্রামীণ কবিদের লেখনীতে যে অজস্র প্রেমকাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে-তার গভীরতা আর বৈচিত্র আমাদের মনকে ভরিয়ে দেয়। এইসব প্রেম কাহিনীর প্রেমিক প্রেমিকাদের প্রেম ইন্দ্রিয়সংরাগময় হলেও স্থূল নয়। পূর্ববঙ্গ গীতিকা আমাদের উপহার দেয় নারী পুরুষের নিবিড় আত্মনিবেদনে গড়ে ওঠা প্রেমকাহিনি। এত দিনের মূল্যায়নে সেখানে নারীরই প্রাধান্য। প্রেমকে সার্থক করার জন্য এগিয়ে আসে নারী, প্রতিহত ভালোবাসার যন্ত্রণাকে গ্রহণ করে নারী। নারী ও পুরুষের প্রেম, বিচ্ছেদ ইত্যাদি গীতিকার বিষয় বস্তু হয়ে ওঠে। নানান ছোটো ছোটো কাহিনি নিয়ে রচিত হয় গীতিকা। লোকসাহিত্যে মৈমনসিংহ গীতিকা একটি বৃহত্তর জায়গা করে নিয়েছে। যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন এই গীতিকাও প্রচলিত থাকবে।

সূচক শব্দ: গীতিকা, প্রেম, নারী, মৈমনসিংহ, দেব-দেবী।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পূর্ব মৈমনসিংহ গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনে ছিল। পরে এই প্রদেশ গুপ্ত শাসন হতে স্বতন্ত্র হয়ে প্রাগজ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হয়েছিল। কামরূপের শাসনে এই দেশ একসময় হিন্দুধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। চীনা পর্যটক এই সকল দেশের লোকের চরিত্র ও শিক্ষা দীক্ষার প্রশংসা করে গিয়েছেন। প্রাগজ্যোতিষপুরের অবনতির পরে পূর্ব মৈমনসিংহ কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। রাজবংশীয়, কোচ এবং হাজাং প্রভৃতি শ্রেণির লোকেরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করতেন। প্রাগজ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং মুসলমান বিজয় — দুই-তিন শতাব্দীকাল অপর এক রাষ্ট্রীয় মহাশক্তি এই পূর্ব মৈমনসিংহ দেশটিকে গ্রাস করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেন বংশীয় রাজাগণ পশ্চিম মৈমনসিংহ অধিকার করলে ও বহু বিল সমন্বিত, নদীমাতৃক, বর্ষায় দুর্গম ও অরণ্যবহুল পূর্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারেন নি। সুতরাং এই পূর্ব মৈমনসিংহ চিরকালই সেন বংশ প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও কৌলিন্য হতে স্বীয় স্বতন্ত্র রক্ষা করে এসেছিল। কামরূপ শেষকালে তান্ত্রিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তন্ত্রাধিকারের পূর্বে কামরূপে যে হিন্দুধর্মের আদর্শ ছিল পূর্ব মৈমনসিংহ তাই গ্রহণ করেছিল। সেই হিন্দু ধর্ম উদার তাতে বৌদ্ধ কর্মবাদ ও হিন্দু নিষ্ঠার অপূর্ব মিশ্রণ ছিল। এই হিন্দুধর্মে বাল্লাল সেন প্রবর্তিত ‘গৌরীদান’ আচার বিচারের চুলচেরা হিসাব, ছোঁয়াচে রোগ ও ভক্তিবাদ ছিল না। পূর্ব মৈমনসিংহ রঘুনন্দনকে গ্রহণ করেনি, সম্ভবত তখনো জাতিভেদ সেই দেশে এরূপ কঠোর হয়ে ওঠেনি। তখন অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং প্রণয় পথে ব্যর্থকাম হয়ে হিন্দু রমণী আজন্ম কুমারীরূপে অবলম্বন পূর্বক তপস্বিনী হতে পারতেন।

শুধু বঙ্গ রমনীর কথা নয়, সকল গাঁথায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক দিক স্পষ্ট হয়েছে। ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়, শূন্যপুরাণ, সর্বের ছড়া, চণ্ডী ও মনসা দেবীর আদি গান, ব্রতকথা, রূপকথা, ডাক ও খনার বচন — প্রাচীন সাহিত্যের এই বিবিধ রচনার সঙ্গে এই গীতগুলোর এক পংক্তিতে স্থান হবে। যে কালে সেই সকল প্রাচীন পালা রচিত হয়েছিল (১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে) তখন হিন্দু জাতি সতেজ ও সবল ছিল। বাঙালি জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা উচ্চ ছিল। বাঙালি বণিক সমুদ্রকে রত্নাকর নামে অভিহিত করে, সেই অসীম জল পথকে রত্নসংগ্রহের রাজপথ বলে মনে করত। স্বাধীন দেশের তেজ্যেদীপ্ত লোকেরা এই সকল পালা রচনা করছিল। এইজন্য কালু ডোমকে সত্যরক্ষার জন্য কাছার তলোয়ারে নিকট নিজ মস্তিষ্ক বাড়িয়ে দিতে দেখা যায়, চাঁদ সওদাগরের ধনুর্ভঙ্গা পণ, সর্বত্যাগী বীরত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

গীতিকা ইংরেজী ‘ব্যালাড’এর বাংলা প্রতিশব্দ ‘গাঁথা’ বা ‘গীতিকা’। সংস্কৃত ও পরবর্তী প্রাকৃত সাহিত্য ‘গাঁথা’ বলতে আখ্যানমূলক গীতি কবিতাকেই বোঝাত। মূলত গাইবার জন্য রচিত হতো বলেই গাঁথার মৌলিক ধর্মই হলো সুরপ্রধান কাহিনি বর্ণনা। ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা গীতিকা বা গাঁথার উদ্ভব হয়েছে। বাংলা গীতিকা ইংরেজী ‘ব্যালাড’এর তুলনায় অধিকতর দীর্ঘ। ‘গাঁথা’ বলতে সাধারণত একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্যক্তি নিরপেক্ষ গীতিময় কাহিনিকে বোঝায়। লোকনাট্যের কতগুলি ধর্ম ও গাঁথা আত্মসাৎ করেছে, যেমন সংলাপধর্মিতা ও নাটকীয়তা। বাংলা গীতিকার ত্রিস্তর — গোপীচন্দ্রের গান, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার মধ্যে সুরক্ষিত। মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলিতেই মানবস্বভাব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ম এখানেই একান্ত শিথিল। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পটভূমিতে এই গাঁথাগুলির উদ্ভব ও বিকাশ। নারীর স্বাধীন স্বত্ত্বা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার গ্রামীণ কবিদের লেখনীতে যে অজস্র প্রেমকাহিনির সৃষ্টি হয়েছে, তার গভীরতা আর বৈচিত্র্য আমাদের মনকে ভরিয়ে দেয়। এইসব প্রেম কাহিনির প্রেমিক প্রেমিকাদের প্রেম ইন্দ্রিয়সংরাগময় হলেও স্থূল নয়। পূর্ববঙ্গ গীতিকা আমাদের উপহার দেয় নারী পুরুষের নিবিড় আত্মনিবেদনে গড়ে ওঠা প্রেমকাহিনি। এত দিনের মূল্যায়নে সেখানে নারীরই প্রাধান্য। প্রেমকে সার্থক করার জন্য এগিয়ে আসে নারী, প্রতিহত ভালোবাসার যন্ত্রণাকে গ্রহণ করে নারী। এই সত্যকে অস্বীকার করে ও প্রশ্ন তোলা যায় প্রেমিক পুরুষের আবেগ আর যন্ত্রণাও কি কম! পূর্ববঙ্গ গীতিকার কাহিনি সেই প্রতিষ্ঠান অনির্ভর প্রেমের বিস্মৃতময় যন্ত্রণা আর আনন্দের ইতিবৃত্ত। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় প্রেমের গভীরতা আর শক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে সমাজ নিষিদ্ধ প্রেমে।

মহুয়া গীতিকায় মহুয়ার রূপ আর ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যের পাশাপাশি আপাত দৃষ্টিতে নিপ্রভ মনে হয় নদের চাঁদ চরিত্রটি। নদের চাঁদ চরিত্রের মহত্ব অন্যত্র। প্রণয়াবেগে যে পরিত্যাগ করেছে তার জাত, ধর্ম, সম্পদ, প্রতিপত্তি, সমাজ, পরিবার ও নিরাপত্তা। বেদের ঘরে পালিত এক তরুণীর প্রেমের একনিষ্ঠ বিশ্ববিজয়ী তপস্যার শক্তি যত বড়োই হোক না কেন, এই পুরুষের ত্যাগের মহিমা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এই গীতিকায়, নদের চাঁদ আর মহুয়ার প্রেমের পাশাপাশি আর এক উপেক্ষিত প্রেমিকের কথা মনেই থাকে না আমাদের, সে সুজন বাইদ্যা। ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নবীন অনুরাগের লীলা চঞ্চল হিল্লোলে মহুয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে ব্যাকুল সুজন তাকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। নারী শরীর লোভী বণিক আর সন্ন্যাসীর পাশাপাশি বেদের দলের এই যুবকটির আন্তরিক প্রেমের ব্যর্থ ব্যাকুলতা আমাদের বেদন বিধ্ব করে।

সুন্দরী মলুয়ার নায়ক চাঁদবিনোদও প্রথম দর্শনেই মলুয়ার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু তার প্রেম নদের চাঁদের মতো আত্মবিস্মৃত নয়। তার সামাজিকতা ক্রিয়াশীল। চাঁদ বিনোদের প্রেম নিবেদনেও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুন্দরী মলুয়ার কাছে সে তার পরিচয় জানতে চেয়েছে। আর সেই সঙ্গে এও জানিয়েছে মলুয়া যদি বিবাহিত হয়, তবে সে তাকে একবার দেখেই ফিরে যাবে। আর কোনোদিন শিকারে আসবে না। মলুয়ার স্বচ্ছল পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করার পর ভাগ্য অন্বেষণে পথে বেরিয়ে পড়েছে চাঁদবিনোদ। এই ঘটনার তীব্র প্রেমানুরাগের সঙ্গে

তার দৃঢ় পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে। কাঞ্চনকন্যা গীতিকায় ধোপার মেয়ে কাঞ্চনকে রাজকুমার ভালোবাসলো। এখানেও রাজার ক্রোধ কাঞ্চনের পিতাকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু কাঞ্চনকন্যার প্রেমিক শ্যাম রায় নয়। সে ধরা দিয়েছে রাজকন্যা বুদ্ধিনীর প্রেমে। কাঞ্চনকন্যা সুখী স্বামীকে একবারের জন্য দেখে নিয়ে আত্মহত্যা করেছে। শুধু প্রেম নয় বাৎসল্যের বিচিত্র রূপায়ণ পূর্ববঙ্গ গীতিকার জগৎ আর জীবনকে পূর্ণতা দিয়েছে। প্রেমিক পুরুষ শুধু নয়, স্নেহে মমতায় বাৎসল্যে মিশ্র পুরুষের করুণ দাক্ষিণ্য গীতিকার নায়িকাদের জীবনের সমস্ত সামাজিক অসংগতির বিপরীতে আশীর্বাদের মতোই নেমে এসেছে।

অপর দিকে দেখা যায় কাজল রেখা মৈমনসিংহ গীতিকার রূপকথাধর্মী পালা। ভাটিয়াল দেশে এক সদাগর ছিলেন। তার নাম ধনেশ্বর। তার সুন্দরী কন্যার নাম কাজল রেখা। আর আছে ধর্মবতী সুখ পাখি। কাজল রেখার ভাগ্য নির্ণয়ে ধনেশ্বর সুখ পাখির পরামর্শ চান। সুখ বলে মরা স্বামীর সঙ্গে এর বিয়ে হওয়া নিয়তি নির্দিষ্ট। দেরি না করে কাজল রেখাকে বনবাসে পাঠাও। ধনেশ্বর ভগ্ন হৃদয়ে কাজল রেখাকে ডিঙায় তুলে গভীর বনে নিয়ে আসেন। নদীতীর সংলগ্ন একটি মন্দিরের দরজায় হাত রাখতেই দরজা খুলে যায়। মন্দিরে প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ধনেশ্বর অনেক চেষ্টা করেও দরজা খুলতে বিফল হন। কাজল ভিতরে দেখতে পেল অজ্ঞো অসংখ্য সূচ বিম্ব হয়ে বেদীর উপর শায়িত আছেন এক মৃত রাজকুমার। সুখ পাখির গণনার কথা বলে কন্যাকে প্রবোধ দেন। যে মৃত রাজকুমারই তার স্বামী। এটাই বিধির বিধান। মন্দিরে প্রবেশ করেন এক সন্ন্যাসী। সূচ তুলে রাজকুমারের চোখের পাতায় রস দেন। চোখের সূচ তোলার আগে স্নান সমাপনের জন্য নদীতে যায়। সেই সময় এক ব্যক্তি অভাবে পড়ে তার কন্যাকে বিক্রি করতে পথ দিয়ে হেঁকে চলে। কাজল রেখা কঙ্কন দিয়ে কিনে তার নাম দেয় কাঁকন মালা। সকল বিবরণ দিয়ে কাঁকনমালাকে মন্দিরে পাঠিয়ে দেয়। কাঁকনমালা সুযোগের সন্ধ্যাবহার করে চোখের সূচ তুলে পাতায় রস ঢেলে রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে তোলে। রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে তোলার পর মন্দিরে তিন সত্য করে বিবাহ করে। কাজল রেখা মন্দিরে ঢুকে এই আকস্মিকতায় মর্মান্বিত হয়। রূপবতী কাজল রেখাকে দেখে রাজপুত্র সচকিত হন। কাঁকনমালা কাজল রেখাকে দাসী বলে পরিচয় দেয়। এরপর তারা রাজ্যে ফিরে আসে। বিভিন্ন পরীক্ষায় নকল রাণী পর্যুদস্ত হয়। আর কাজল কৃতকার্যতায় সকলকে মুগ্ধ করে। রাজা কাজল রেখার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। নকল রাণী কাজল রেখার চরিত্রে দাগ টেনে বনবাসে পাঠিয়ে দেয় রাজার নির্দেশে। রাজা কাজল রেখার বিহনে থাকতে না পেরে নৌকা সাজিয়ে তার সম্মানে বেরিয়ে পড়েন। কাজলকে ফিরে পেয়ে রাজ্যে নিয়ে আসেন। সভা ডাকা হয়। কাজল রেখার জন্য বাণিজ্য থেকে কিনে আনা সুখ পাখির পরামর্শে নকল রাণীকে বনবাসে পাঠিয়ে কাজল রেখাকে বিবাহ করেন। সুখে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। এই ভাবেই পূর্ব মৈমনসিংহ গীতিকা প্রচলিত হয়। নারী ও পুরুষের প্রেম, বিচ্ছেদ ইত্যাদি গীতিকার বিষয় বস্তু হয়ে ওঠে। নানান ছোটো ছোটো কাহিনি নিয়ে রচিত হয় গীতিকা। লোকসাহিত্যে মৈমনসিংহ গীতিকা একটি বৃহত্তর জায়গা করে নিয়েছে। যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন এই গীতিকাও প্রচলিত থাকবে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ‘গ্রামীন সংগীত সংগ্রহ’, দিনেন্দ্র চৌধুরী
২. ‘বাংলার লোক সাহিত্যচর্চার ইতিহাস’, বরুণকুমার চক্রবর্তী
৩. ‘বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ’, দুলাল চৌধুরী
৪. ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’, দীনেশচন্দ্র সেন

লেখক পরিচিতি: মণিকা রায় কুণ্ডু, সহকারী অধ্যাপিকা, সঙ্গীতবিদ্যা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।